Belles-Lettre 2023, Vol. 1, pp. 162-173

কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধে সাহিত্যচিন্তা : বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন

হাসিনা খাতুন

সাহিত্য কী? সাহিত্য কীভাবে সৃষ্টি করা যায়? সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ ও কৌতূহল তীব্র বলে এই সংক্রান্ত প্রশ্নেরও শেষ নেই। এই প্রশ্নই ক্রমাগত পুঞ্জীভূত হয়ে মানুষকে সাহিত্যতত্ত্বের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। সাহিত্য কী বা তার স্বরূপ প্রকৃতি কী তা জানার চেষ্টাও বহু পুরোনো। পাশ্চাত্যে এবং আমাদের দেশের চিন্তাশীল সাহিত্যতাত্ত্বিকগণ এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। আমরা সহজভাবে বলতে পারি সাহিত্যের বিষয় আমাদের স্থূল প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত নয়। মানবজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়েই সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। সাহিত্যে মানবমনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং মানবজীবনের শাশ্বত ও চিরন্তন অনুভূতি প্রতিফলিত হয়। তাই সাহিত্য বলতে আমরা সেইসব রচনাকেই স্বীকৃতি দিই, যেগুলি মানবজীবনের বিচিত্র ও জটিল অভিজ্ঞতাসমূহকে অর্জিত করে কোন বিশেষ সৃজন রূপে যার সৃষ্টি। কাকে বলে সাহিত্য? এ প্রশ্ন জেগেছিল একেবারে আদিকবি বাল্মীকির মনে। সংস্কৃত আলংকারিকেরাও সাহিত্য বিষয়ে বহু চিন্তিত প্রয়াস উপস্থিত করেছিলেন – ধ্বনিবাদী, রসবাদী, রীতিবাদী তাত্ত্বিকদেরকেও অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করতে দেখা গিয়েছে। সাহিত্য বিষয়ে মূল্যবান আলোচনার ক্ষেত্রে অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স এক অমূল্য সম্পদ। এরপর দীর্ঘকাল যাবৎ সাহিত্যতাত্ত্বিকেরা নিযুক্ত থেকেছেন সাহিত্যচিন্তা, সাহিত্যের স্বরূপ, সাহিত্যের লক্ষণ বিচার ইত্যাদি কাজে। সাহিত্যচিন্তা মূলত মননচিন্তাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে ও বিকাশ লাভ করে। এছাড়াও পূর্বসূরীদের সাহিত্যের আদর্শ, জীবনের অভিজ্ঞতা, সমাজ পরিবেশও সাহিত্যচিন্তা গড়ে তুলতে সহায়কের ভূমিকা পালন করে। এসমস্ত কিছুর অভাবেই আধুনিক যুগের আগে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচিন্তা গড়ে উঠতে দেখা যায়নি। উনিশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রভাবে বাঙালির মননের সমৃদ্ধি ঘটে এবং তার সাথে সাহিত্যচিন্তা গড়ে উঠতে দেখা যায়। বাংলা ভাষায় সাহিত্যচিন্তার সূচনা করেছিলেন মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। তবে প্রকৃতভাবে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ লেখার সূচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)। সেই প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্য সংক্রান্ত নিজস্ব ধারণা, চিন্তাভাবনাকে উপস্থাপিত করেছিলেন। তারপরে রবীন্দ্রনাথ

....

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর রচনায় তাঁর সাহিত্যচিন্তার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ ইত্যাদি গ্রন্থগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রযুগেই আমরা পাই বিখ্যাত প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)-কে। প্রমথ চৌধুরীর রচিত প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব সাহিত্যভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। এরপরই বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। তিনি সাহিত্যসৃষ্টির পাশাপাশি প্রায় শুরু থেকে সাহিত্য বিষয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ধারণা ব্যক্ত করে গেছেন।

দুই.

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের জগতে এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতা আমাদের মুগ্ধ করে। কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সুসমৃদ্ধ করে রেখেছে। তবে বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম কবি হিসেবেই অধিক পরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁর গদ্য রচনা সম্পর্কে তেমন আলোচনা লক্ষ্য করা যায় না। নজরুলের গদ্য রচনা শুধু বিষয়ের দিক থেকে নয়, ভাষা, বর্ণনা, রূপ এবং প্রকারেও স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল। নজরুল প্রতিভার বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা তাঁর কবি ও গীতিকার এই দুই সত্তাকে নিয়েই অধিক। তাই অধিকাংশ গ্রন্থের বিষয়ও নজরুলের কাব্য-কবিতা, গান ও সুর বিষয়ক। নজরুলের সাহিত্যিক জীবন কেবলমাত্র কবি নজরুল কিংবা তাঁর গীতিকার নজরুলের পরিচয়েই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর উপন্যাস-ছোটগল্প-নাটক-প্রবন্ধ রচনাও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং এই সমস্ত ধারা মিলিয়েই তাঁর সাহিত্যজীবন গড়ে উঠেছে।

নজরুলের সাহিত্যিক কর্মের মধ্যে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল তাঁর প্রবন্ধ সাহিত্য। নজরুলের সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা তাঁর নিজস্ব সাহিত্যচিন্তার স্বরূপকে তুলে ধরার চেষ্টা করব। নজরুল ইসলাম বিশুদ্ধ প্রাবন্ধিক ছিলেন না। সমসাময়িক পরিস্থিতি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তিনি সাধারণত প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রবন্ধের ভাব-বিষয় সম্পূর্ণ নিজস্ব ছিল। নবযুগ (১৯২০), ধূমকেতু (১৯২২) ইত্যাদি পত্রিকা সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনি সম্পাদকীয় কলমে বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যেগুলি পরবর্তীকালে বিভিন্ন গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, নজরুলের প্রবন্ধগুলি সংবাদপত্রের জন্য রচিত। নজরুল ইসলাম বিভিন্ন বিচিত্র বিষয়ের উপর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। নজরুলের প্রাবন্ধিক রূপে সক্রিয়ভাবে

আত্মপ্রকাশে সংবাদপত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রাবন্ধিক সত্তার বিকাশ ঘটেছে মূলত সংবাদপত্রের পাতায়। নজরুলের প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থগুলি হল যথাক্রমে- যুগবাণী (অক্টোবর, ১৯২২), রাজবন্দীর জবানবন্দী (এপ্রিল, ১৯২৩), দুর্দিনের যাত্রী (অক্টোবর, ১৯২৬) এবং রুদ্রমঙ্গল (১৯২৭)।[১]

তিন.

কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধের একটি উল্লেখযোগ্য প্রান্ত হল তাঁর সাহিত্যচিন্তা। সাহিত্য কী? অথবা সাহিত্য-সম্পর্কিত গূঢ় তত্ত্ব কথার প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধে আমরা পাই না। কিন্তু শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার সুস্পষ্ট অভিমত তাঁর চিঠিপত্র, অভিভাষণ ও প্রবন্ধে অভিব্যক্ত হয়েছে। তাঁর নিজস্ব সাহিত্যচিন্তা ছিল। তাঁর নিজস্ব সাহিত্যচিন্তার স্বরূপ তাঁর কাব্য-কবিতা ছাড়া প্রবন্ধেও প্রতিফলিত হয়েছে। সাহিত্যসৃষ্টির পাশাপাশি প্রায় শুরু থেকে তিনি সাহিত্য বিষয়ে তাঁর নিজস্ব মত জ্ঞাপন করেছেন। সাহিত্যজীবনের শুরু থেকেই সাহিত্যের রূপ-স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর যে সম্যক ধারণা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান' নামক প্রবন্ধে। 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান' প্রবন্ধটি যুগবাণী প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত। উক্ত প্রবন্ধটি তাঁর সাহিত্যচিন্তা বিষয়ক প্রথম রচনা। এটি তাঁর সাহিত্যচিন্তা বিষয়ক প্রথম রচনা হলেও, উক্ত প্রবন্ধে তাঁর যে চিন্তা অভিব্যক্ত হয়েছে তা যেমন গভীর তেমনি মৌলিকও।

'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান' প্রবন্ধটি পাঠ করলে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা কত গভীর ও ব্যাপক ছিল। তাঁর কাছে সাহিত্য ছিল প্রাণের অভিব্যক্তি। যে সাহিত্য জড়, যে সাহিত্যের মধ্যে প্রাণ নেই, সেই নির্জীব সাহিত্য আমাদের কোন উপকার করতে পারে না। আর সেই নির্জীব সাহিত্য তাই ক্ষণস্থায়ী হয়। যে সাহিত্যিক বা লেখকের প্রাণ নেই, কিংবা যিনি জড় তিনি লেখায় প্রাণ সৃষ্টি করতে পারেন না। তিনি লেখায় ব্যক্ত করতে পারেন না সেই প্রাণের অভিব্যক্তি। যাঁদের জীবন একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন তাঁদের পক্ষে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই নজরুল বলেছেন –

> সাহিত্যের মুক্তধারায় থাকিবে চলার আনন্দ, স্রোতের বেগ এবং ঢেউয়ের কল-গান ও চঞ্চলতা।[২]

শুধু আবর্জনা, কঙ্কাল ও জড়তার মুদ্রিত রূপকে তুলে ধরা সাহিত্য নয়, সাহিত্যে থাকতে হবে লেখকের প্রাণশক্তি, চিন্তাশক্তি ও ভাবসম্পদ। উক্ত প্রবন্ধে সাহিত্যে প্রাণের সঞ্চার সৃষ্টি করার জন্য তিনি সাহিত্যিকের শরীরকে নীরোগ রাখার

কথা ব্যক্ত হয়েছে। শরীর নীরোগ থাকলে আপনা-আপনি তাতে এক বিমল ও শুভ্র আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখা দেয়। তাই যে লেখকের স্বাস্থ্য যত ভালো, তিনি তত প্রফুল্লচিত্ত হন এবং সেই অনুপাতে তাঁর লেখাও তত বেশি কলমুখর হয়ে উঠতে পারবে। সাহিত্যিকের সবসময় প্রফুল্লচিত্তে থাকার জন্য সংগীত চর্চার প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গটিও তাঁর সাহিত্যচিন্তায় পাওয়া যায়। উক্ত প্রবন্ধে আর্ট সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কাছে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেন –

তিনিই আর্টিস্ট, যিনি আর্ট ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। আর্ট-এর অর্থ সত্যের প্রকাশ (execution of truth), এবং সত্য মাত্রেই সুন্দর, সত্য চিরমঙ্গলময়।[৩]

'Beauty is truth, truth beauty' – Keats এর এই বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিল্প ও সত্যের সংযুক্তি নজরুলেরও অভিপ্রায়। শিল্প ও সত্যের সঙ্গে নজরুল যুক্ত করেছেন চিরন্তন মঙ্গলবোধের দর্শনকে। সাহিত্যিককে তাঁর রচনার মধ্যে সত্যের সৌন্দর্য ও মঙ্গলকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। দেশের তরুণ সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে এই মহাশক্তি অর্জনের আহ্বান জানিয়েছিলেন নজরুল। সাহিত্যিকের লক্ষ্য হবে সত্য এবং তাঁর ব্রত হবে সুন্দর ও মঙ্গলের সৃষ্টি সাধনা। রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'সৌন্দর্যবোধ' প্রবন্ধে মঙ্গলের সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্পর্ককে স্বীকার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এর কথায়, 'সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ'। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের সাহিত্যকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায়। জড়, নিষ্প্রাণ, নির্জীব সাহিত্য যে শিল্পোত্তীর্ণ হতে পারে না বলে তা তিনি স্বীকার করতেন। তিনি বাস্তবতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন তাঁর লেখায়। তাঁর সাহিত্যে কোথাও যে কল্পনার সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়নি তা নয়। তবে তিনি যত বেশি প্রকৃতির কবি, সৌন্দর্যের কবি ছিলেন তার থেকে বহুগুণ বেশি সর্বসাধারণের কবি, বাস্তবের কবি ছিলেন। যে সাহিত্যিকের প্রাণ যত বেশি উদার, যত বেশি উন্মুক্ত হবে তিনি তত বড় সাহিত্যিক এবং প্রকৃত সাহিত্যিক। নজরুল সাহিত্যকে বলেছেন বিশ্বের, সাহিত্য কারোর একার নয়। তিনি সাহিত্যে সর্বজনীনতার কথা বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বলেছেন –

সাহিত্য হইতেছে বিশ্বের, ইহা একজনের হইতে পারে না। সাহিত্যিক নিজের কথা নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, বিশ্বের ব্যথায় ছোঁওয়া দিবেন। সাহিত্যিক যতই কেন সূক্ষ্মতত্ত্বের আলোচনা করুণ না, তাহা দেখিয়াই যেন বিশ্বের যে কোনো লোক বলিতে পারে, ইহা তাঁহারই অন্তরের অন্তরতম কথা; ইহা তাঁহারই বুকে গুমরিয়া মরিতেছিল, প্রকাশের পথ পাইতে ছিল না। এইরূপেই বিশ্ব-সাহিত্য সৃষ্টি হয়, ইহাকে বলে সাহিত্যে সর্বজনীনতা।[৪]

তাই আমরা বলতে পারি, বিশ্বব্যাপী বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, ক্ষুধাতুর মানুষের মর্মযন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশই হল সাহিত্য। এটিই হল তাঁর সাহিত্যরচনার মূল নীতি বা তত্ত্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধে সাহিত্যে সর্বজনীনতার কথাই বলেছিলেন। এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সাহিত্যচিন্তার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সাহিত্য চিরন্তন মানবাত্মার প্রাণবাণী। মানবজীবন মথিত সত্যবাণীই সাহিত্যের সত্য কথা। আর্ট বা শিল্প বাস্তব জীবনবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বস্তু নয় আর বাস্তবতা বিবর্জিত আর্টের কোন মূল্য ছিল না নজরুলের কাছে। তাই তাঁর সাহিত্যে দেশ কাল আর মানুষই মূর্তমান। মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গীত রচনাতেই ছিল তাঁর পরম পূর্তি। মানুষের বেদনাবোধই তাঁকে করে তুলেছিল কবি, সাহিত্যিক, বিদ্রোহী, মানবতাবাদী। তাই তাঁর সাহিত্য শুধু সেদিনকার সাহিত্য নয়, যুগ-যুগান্তরের সাহিত্য। তাঁর সাহিত্য বিচারের বস্তু নয়, প্রয়োজনের সামগ্রীও। মানুষের জয়গানে যাঁরা নতুন জীবনকথা সৃষ্টি করতে পারেন তাঁরাই যুগস্রষ্টা। কাজী নজরুল ইসলামও এমন-ই একজন যুগস্রষ্টা সাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্যচিন্তার স্বরূপ বোঝার জন্য এই প্রবন্ধটি প্রশংসার যোগ্য। উক্ত প্রবন্ধটিতে তিনি তৎকালীন মুসলমান লেখকদের সাহিত্যরচনার দুবর্লতা, সংকীর্ণতা ও অদূরদর্শিতার যেমন সমালোচনা করেছেন, তেমনি ভবিষ্যতের তরুণ লেখকদেরকে সাহিত্যিক দিক-নির্দেশনাও দিয়েছেন। আর এই নির্দেশনা দিতে গিয়ে সাহিত্যবিষয়ক নিজস্ব চিন্তাভাবনার যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর চিন্তার গভীরতা ও মৌলিকতা প্রকাশিত হয়েছে।

চার.

এবার আসা যাক নজরুলের লেখা 'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য' নামক প্রবন্ধটির মূল বক্তব্যে। এই প্রবন্ধটিতেও তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে নানান চিন্তাধারা ব্যক্ত হয়েছে। সাহিত্যে মানুষের আনন্দ-বেদনার বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটে। বিশ্বে প্রেমও আছে, আবার যুদ্ধও আছে। সুতরাং সাহিত্যে প্রেমের কথা যেমন থাকবে, তেমনি যুদ্ধের কথাও থাকতে পারে। তাঁর কাব্য-কবিতায়, কিংবা প্রবন্ধে যাই হোক না কেন, মানুষের আনন্দ, বেদনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার চেতনাকে বাণীরূপ দেওয়ার প্রয়াস দেখা যায়। বলা বাহুল্য, তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁকে বার বার সমালোচিত হতে হয়েছিল। নন্দনতাত্ত্বিকদের অতি রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিয়ে সবসময় সাহিত্যসৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সমালোচকদের সমালোচনা বা নির্দেশনা উপেক্ষা করে অন্তর ও বিবেকের উপলব্ধিকে

প্রকাশ করতে পারলে তাঁর কাছে তা সাহিত্য না হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। তিনি তাঁর সাহিত্যচিন্তার মধ্য দিয়ে এই তত্ত্বই প্রচার করতে চেয়েছেন যে, সাহিত্য শুধুই রূপ বা সৌন্দর্য সৃষ্টি নয় তা একই সঙ্গে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আনন্দ-বেদনারও প্রকাশরূপ। তিনি মানুষ ও মানবতার অনিবার্য প্রয়োজনে সাহিত্যের আদর্শকে কিছুটা ছোট করতেও দ্বিধান্বিত হন নি। কারণ, সাহিত্যের শৈল্পিক সৌন্দর্য ছাড়াও বা তারই পাশাপাশি সাহিত্যের যে সামাজিক-মানবিক ভূমিকা রয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা পরিষ্কার ছিল।

এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে আমরা তৎকালীন সাহিত্যের দুটি দিকের বা দলের কথা জানতে পারি। একদল সাহিত্যিক সাহিত্যে সৌন্দর্য, কল্পনা, প্রেম ইত্যাদি বিষয়কেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এই দলের মধ্যে ছিলেন – নোগুচি, ইয়েটস্‌, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ। এবং অপর দল সাহিত্যে বাস্তবতার কথা, বিদ্রোহের কথা, দরিদ্র সাধারণ মানুষের কথাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন গোর্কি, য়োহান বোয়ার, বার্ণাড শ, বেনাভাঁতে প্রমুখ সাহিত্যিকগণ। তিনি নিজে ছিলেন হুইটম্যান, বার্ণাড শ, গোর্কি, য়োহান বোয়ার, বেনাভাঁতে প্রমুখদের দলে। হুইটম্যান প্রমুখ পাশ্চাত্য সাহিত্যিকদের সাহিত্য নজরুলকে প্রভাবিত করেছিল। নজরুল সাহিত্যে সমাজবাস্তবতাকে প্রাধান্য দেওয়ার পক্ষে ছিলেন। উক্ত প্রবন্ধেও তিনি নবীন লেখকদেরকে সাহিত্যে মানুষের জীবনবাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার কথা বলতে চেয়েছেন। সাহিত্যে সমাজ-বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার মধ্য দিয়েই নবীন লেখকদের প্রতিভার মুক্তি ও সাফল্য আসতে পারে তা উক্ত প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। এর ফলে নবীন লেখকেরা রবীন্দ্রনাথ, নোগুচি, ইয়েটস্‌ প্রমুখ সাহিত্যিকদের পাশে বসতে হয়তো পাবে না, কিন্তু তাঁরা হুইটম্যান, গোর্কি, য়োহান বয়ারের পাশে মাটির পৃথিবীতে বসার অধিকার নিশ্চয়ই পাবে। তিনি উক্ত প্রবন্ধে তাই ব্যঙ্গের সুরে বলেছেন –

> আজকের বিশ্ব-সাহিত্যে এই হনুমানও লাফাচ্ছে এবং সাথে সাথে স্বর্ণলঙ্কাও পুড়ছে – এ আপনারা যে – কেউ দিব্যচক্ষে দেখছেন বোধ হয়। না দেখতে পেলে চশমাটা একটু পরিষ্কার করে নিলেই দেখতে পাবেন। দূরবিনের দরকার হবে না।[৫]

সাহিত্য হল স্রষ্টার ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ - এই ব্যক্তিত্বের সুপ্তচেতনায় নজরুল সন্ধান করেছেন সাহিত্যকে, শিল্পকে। কোন উচ্চমার্গীয় বিমূর্ত ভাব-কল্পনার দ্বারা নজরুল তাঁর সাহিত্য, শিল্পকে আহ্বান জানান নি। রাবীন্দ্রিক কল্পনাচেতনা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি বাস্তবতাবোধের স্বাভাবিক প্রবণতায় উপলব্ধি করেছিলেন যে, যিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণের

ঊর্ধ্বে উঠে উন্মুক্ত আকাশের মতো ব্যক্তিত্বচেতনার সত্যে উদ্দাম চঞ্চলতায় সাহিত্যে নতুন ধারা সৃষ্টি করেন তিনিই বড় সাহিত্যিক। তাঁর কাছে সাহিত্য ছিল সাধারণ মানুষের মর্মযন্ত্রণার বহি:প্রকাশ। এই কারণে তিনি 'বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য' প্রবন্ধে নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশেও নির্দ্বন্দ্ব ছিলেন –

গোর্কির পরে যে সব কবি-লেখক এসেছেন, তাঁদের নিয়ে বিশ্বের গৌরব করবার কিছু আছে কি না তা আজও বলা দুষ্কর।[৬]

উক্ত প্রবন্ধটি বিশ্লেষণ করে নজরুলের সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কে আমরা বুঝতে পারি যে, নজরুলের ভাবানুভূতি মানবিক, লোকায়ত ও চিরায়ত। তার উপস্থাপনই মহৎ সাহিত্য। সাহিত্য ব্যক্তি-মানসের প্রতিফলন ও সাহিত্য প্রাণের উপলব্ধি। এই হল নজরুলীয় সাহিত্যচিন্তার মূল তত্ত্ব। সংকীর্ণতার গণ্ডি পেরিয়ে মৌলিক সত্য প্রতিষ্ঠা করে তাকে বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা এবং দেশীয় ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে সাহিত্যকে সর্বজনীন করে তোলার তত্ত্বই নজরুলের সাহিত্যচিন্তার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

পাঁচ.

সাহিত্যিক বিষয় নিয়ে লেখা নজরুলের তৃতীয় তথা শেষ প্রবন্ধটি হল 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ'। নজরুল বিশুদ্ধ প্রবন্ধ লেখেননি। তাঁর সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে তাত্ত্বিক মতামতের প্রাচুর্যতা পাওয়া যায় না। তবে 'সাহিত্য' সম্পর্কে তিনি নিজস্ব কী ধারণা পোষণ করতেন তা স্পষ্টতই আমরা বুঝতে পারি। 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধটি আসলে নজরুলের জবাবদিহি। তিনি সাহিত্যে প্রতিবাদ, বিদ্রোহ, দরিদ্র মানুষের যন্ত্রণাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সাহিত্য-শিল্পের নান্দনিক দিকটা তাঁর রচনাতে তেমনভাবে প্রাধান্য পায় নি। এছাড়াও তিনি তাঁর রচনাতে আরবি-ফারসি শব্দের প্রচুর ব্যবহার করতেন। তাঁর আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বহু আলোচনা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও নজরুলের আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার নিয়ে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। এ নিয়ে দীর্ঘ বাক্-বিতণ্ডা রয়েছে। নজরুল তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এই বিষয় নিয়েই নজরুলের প্রখ্যাত 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে।

নজরুল সর্বদা প্রতিবাদমূলক কবিতা লিখতেন। দেশের মাটিকে অন্তর থেকে তিনি ভালোবাসতেন। তিনি অন্যান্য সাহিত্যিকদের মতো শুধুমাত্র সৌন্দর্য, প্রেম, প্রকৃতি, কল্পনাবিষয়ক কবিতা লেখেননি। তাঁর কাছে সাহিত্যের একটি প্রধান দিক

ছিল সাহিত্যের সামাজিক ও মানবিক ভূমিকা। নজরুলের সাহিত্য পড়ে দেশের তরুণেরা খুব আকৃষ্ট হতেন। ফলে তারা দেশের ও সমাজের কল্যাণের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকতেন। নজরুলের সৃষ্ট সাহিত্য দেশের তরুণদের প্রেরণা জোগাত। এইসব কারণে তাঁর অনেক লেখা ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল এবং তাঁকে বহুবার কারাগারে বন্দী হতে হয়েছিল। নজরুলের সাহিত্যরচনার বিষয়বস্তু, স্টাইল ইত্যাদির জন্য বার বার সমালোচনা করেছিলেন তাঁরই সমকালীন অন্যান্য সাহিত্যিকেরা। ‘বড়র পিরীতি বালির বাঁধ’ প্রবন্ধে আমরা সেই কথার উল্লেখ পাই। এমনকি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও নজরুলের লেখায় আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার নিয়ে তাঁকে অভিযুক্ত করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে উক্ত প্রবন্ধটিকে নজরুলের জবাবদিহি বলা যায়। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্তরকম অভিযোগের যথার্থ জবাব দিয়েছেন তিনি উক্ত প্রবন্ধে। তিনি উক্ত প্রবন্ধে শুধুমাত্র অভিযোগগুলির জবাবদিহিই করেন নি, তার সাথে সাহিত্যে কী ধরণের নোংরামি কাজ করে থাকে তাও তীর্যক সুরে বলতে চেয়েছেন। একজন তরুণ সাহিত্যিককে কীভাবে দমানোর চেষ্টা করা হয় তা তিনি ব্যঙ্গের সুরে বলেছেন এইভাবে –

> বেচারি তরুণ সাহিত্য! যেন বালক অভিমন্যুকে মারতে সপ্তমহারথীর সমাবেশ। বাইরে ছেলেমেয়ের ভিড় জমে গেল। ঘন ঘন হাততালি! বলে, ‘এই! বাঁশ-বাজি দেখতে যাবি, দৌড়ে আয়!’ কিন্তু শুধুই কি সপ্তমহারথীর মার? তাঁদের পেছনের পদাতিকগুলি যে আরো ভীষণ। ধুলো-কাদা-গোবর-মাটি কোনো রুচির বাছ-বিচার নাই, বেপরোয়া ছুঁড়ে চলেছে! মহারথীদের মারে অমর্যাদা নেই, কিন্তু বাইরে থেকে আসা ঐ ভাড়াটে গুণ্ডাগুলোর নোংরামিতে সাহিত্যের বেণু-বন যে পুকুর-পাড়ের বাঁশবাগান হয়ে উঠল।[৭]

এই প্রবন্ধে নজরুল প্রত্যক্ষভাবে তাঁর সাহিত্য সম্পর্কিত চিন্তাভাবনাকে তুলে না ধরলেও সাহিত্যের পাঠককে তা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। নজরুলের কাছে সাহিত্য সত্য-সুন্দরের প্রকাশ হলেও তার সমাজ-মানবিক দিকটি কিন্তু উপেক্ষার বিষয় ছিল না। উক্ত প্রবন্ধেও সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি হলেও তাতে বিশ্বমানুষের ভাব-ভাবনা পরিস্ফুট হওয়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে। তিনি মানুষের আনন্দ, বেদনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার চেতনাকেই সাহিত্যে সর্বাগ্রে স্থান দিতেন। তিনি নন্দনতাত্ত্বিকদের মতো রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্যচিন্তা করেননি এবং সেই মতো সাহিত্যও সৃষ্টি করেননি। তাঁর সাহিত্য রচনার মূলে ছিল মানুষ। তাঁর সাহিত্যানুভূতি মানবিক, লোকায়ত ও চিরায়ত। তার উপস্থাপনকেই তিনি মহৎ সাহিত্যের আখ্যা দিতেন। উক্ত

প্রবন্ধে তিনি এই তত্ত্বই তুলে ধরা হয়েছে।

ছয়.

নজরুল সাহিত্য ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। পরাধীন দেশের যন্ত্রনা, স্বসমাজ ও প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের পারস্পরিক সহাবস্থান সত্ত্বেও তাদের মধ্যে সমস্যা-সংঘাত, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য, অশিক্ষা-কুসংস্কারের প্রবল পীড়ন এবং সর্বোপরি মনুষ্যত্বের অপমান ও লাঞ্ছনা তাঁর হৃদয়ে যে তীব্র আলোড়ন তুলেছিল প্রবন্ধগুলোর মধ্যে তারই স্বতঃস্ফূর্ত ও আবেগময় বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই। তাঁর প্রবন্ধগুলি সমকালীন রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় তিনি তাঁর আবেগচঞ্চল ও উচ্ছ্বাসময় সৃষ্টিমগ্ন চেতনা থেকে রচনা করেছিলেন এই প্রবন্ধগুলি। এ সমস্ত প্রবন্ধের অধিকাংশই সম্পাদকীয় তাগিদে লেখা, কিছু কিছু আবার বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত অভিভাষণ আকারে প্রাপ্ত, তার ফলে সুপরিকল্পিত প্রবন্ধের প্রস্তুতি ও পরিশীলন আমরা তাঁর প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে পাইনা। তাই সমসাময়িক ঘটনার আরোপেই সেগুলির বিচার করা প্রয়োজন। আমরা জানি যে, মননশীলতাই প্রবন্ধের প্রাণধর্ম। প্রবন্ধের ভাষা হয় বুদ্ধিবাদী ও যুক্তিপ্রবণ। প্রবন্ধের এই বৈশিষ্ট্যগুলি নজরুলের প্রবন্ধে আমরা পাইনা। নজরুলের প্রবন্ধে মননশীলতার অভাব রয়েছে। নজরুলের প্রবন্ধের সমালোচনা প্রসঙ্গে এক সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ করা যায় –

> নজরুলের প্রবন্ধ মননশীলতার অভাবে ম্রিয়মান। আবেগের আতিশয্য উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপকে ভারাক্রান্ত। একমাত্র ভাষার পৌরুষ ও বলিষ্ঠতায় তাঁর গদ্য রচনা উৎকৃষ্ট। এজন্য অনেকেই নজরুলের গদ্যকে প্রচারধর্মী, বুদ্ধিহীন বলে থাকেন। প্রবন্ধ রচনার জন্য যে নিষ্ঠা ও রচনার পরে যত্নলালিত পরিমার্জনা দরকার, নজরুলের ধাতে সে সুব্যবস্থা কোনদিনই ছিল না। বর্তমানের চাহিদা মিটাতেই তিনি ছিলেন তৎপর, তাই সাময়িক প্রসঙ্গ তাঁর প্রবন্ধে ভরপুর।[৮]

একথা ঠিক যে, তাঁর সব প্রবন্ধগুলি কালোত্তীর্ণ হতে পারেনি। তবে তাঁর কিছু কিছু প্রবন্ধ সাময়িকতাকে ছাড়িয়ে বাংলা সাহিত্যের দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করেছিল একথাও স্বীকার করতে হয়। উদাহরণ হিসেবে আলোচিত তিনটি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যে বস্তুনিষ্ঠতা, যুক্তি ও চিন্তার নৈর্ব্যক্তিকতা এবং গভীরতা আবশ্যক তা সর্বাংশে অনুসরণ করার মতো যত্নশীল নজরুল ছিলেন না

বলেই চূড়ান্ত বিচারে এগুলিকে প্রবন্ধ বলা যায় কি না সে প্রশ্নই বারবার উঠতে পারে। তবে তিনি নিজেই যখন কিছুটা পরিমার্জনার পর প্রবন্ধ হিসেবে কিছু লেখা প্রকাশ করেন তখন সেগুলো প্রাবন্ধিক নজরুলের মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সাময়িক প্রয়োজন বা সামাজিক কারণে লিখিত হলেও তা নজরুলের ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত করে বলেই এই জাতীয় রচনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়। বিশেষত যখন আমরা জানি যে, নজরুলের প্রবন্ধ রচনা প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাংবাদিক জীবনের প্রতিভাস তখন এগুলিকে অবশ্যই আলাদা তাৎপর্য দিতে হয়। প্রাবন্ধিকের সুস্থিরতা নজরুলের প্রবন্ধে পাওয়া যায় না। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মতোই অকপট, দ্ব্যর্থহীন, প্রবল প্রকাশ তাঁর প্রবন্ধগুলি। প্রবন্ধগুলির মধ্যে যুক্তির প্রতিনিধিত্ব না থাকলেও তাতে রয়েছে স্বজাতি-স্বদেশপ্রেম এবং তা থেকে জাত ভাবোচ্ছ্বাস।

সাধারণত প্রবন্ধসাহিত্য বলতে যা বোঝায়, সেই মানদণ্ডের নিরিখে নজরুলের প্রবন্ধগুলিকে মূল্যায়নের চেষ্টা করব না। তাঁর প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সেগুলি মূলত গুরুত্ব পেয়েছে বিষয়বস্তুর সাময়িকতার জন্য কিংবা কখনও তার ভাষার লালিত্যের কারণে। নজরুলের শুধুমাত্র সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলির মূল্যায়ন করে একথা বলা যায় যে, সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর একটি স্বচ্ছ ধারণা ছিল। আর সেই ধারণা থেকেই তিনি সাহিত্যচিন্তা করতেন। তাঁর সাহিত্যের মতো তাঁর সাহিত্যচিন্তাও নতুন যুগের নতুন ধারার অনুবর্তী। তাঁর সাহিত্যচিন্তা মূলত সমাজবাস্তবতা নির্ভর। তা তাঁর নিজস্ব চিন্তার ফল। তবে তাঁর সাহিত্যচিন্তা যে তত্ত্বসর্বস্ব নয়, তা কিছুটা তত্ত্বলগ্ন একথা অবশ্য স্বীকার্য। তাঁর সাহিত্যচিন্তার মূল বিষয়ই হল আনন্দ, সত্য, সৌন্দর্য, মঙ্গল ও সাহিত্যের মানবিক প্রকাশ। সাহিত্য স্রষ্টার স্বভাবসৃষ্টি হলেও সাহিত্যস্রষ্টার জন্যে অন্যের লেখা পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাঁর প্রবন্ধগুলি থেকে এই বিষয়টি বোঝা যায় যে, তিনি সাহিত্যসৃষ্টির জন্য অন্য কোন লেখকের সাহিত্যপাঠের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করতেন। পূর্বসূরীদের বিভিন্ন রচনা স্রষ্টার নিজের কল্পনা ও চিন্তার ব্যাপ্তিকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে। অন্য লেখকের লেখা পাঠ করলে নিজের লেখার সামান্য-অসামান্যতা উপলব্ধি করা যায়। ফলে লেখার গুণগত মান বৃদ্ধিতে তা সহায়ক হয়ে ওঠে। তিনি পূর্বসূরীদের লেখা পাঠ করে তার থেকে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা লাভ করার চেষ্টাও করতেন। নজরুলের সাহিত্যচিন্তায় এই দিকটি তত্ত্বলগ্ন হয়ে উত্থাপিত হয়েছে। নজরুলের প্রবন্ধগুলি তত্ত্বধর্মী না হলেও সেগুলি যে সময় পরিসর অতিক্রমী কালান্তরের স্মারক হয়ে উঠেছিল একথা অবশ্যই স্বীকার্য। নজরুলের প্রবন্ধসমূহের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এক সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখ করা যায় —

এইসব প্রবন্ধের বাস্তববোধনিষ্ঠ রাজনৈতিক চেতনা, স্বভাবসিদ্ধ ভাবাবেগের প্রাবল্য ও গভীর মানবপ্রেম রচনাশৈলীর ত্রুটি ও উদ্দেশ্যপরতন্ত্রা সত্ত্বেও পাঠকের মনকে দুরন্তভাবে আকর্ষণ করে ও নাড়া দেয়। বস্তুত এইসব রচনা যে রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা উদ্দীপনের জন্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা করতে এরা অনেক পরিমাণেই সফল হয়েছিল – এ কথা মনে রাখলে এগুলির কতকটা সাহিত্যিক মূল্য ছাড়াও একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না।[৯]

নজরুলের প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে একথা আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে, তাঁর প্রবন্ধগুলি তৎকালীন ভারতবর্ষের নানান ঘটনার পটভূমিতে প্রধানত লেখা হয়েছিল। ফলত সেগুলির শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক মূল্য ছিল তা নয় তার সাথে সাথে সাহিত্যিক মূল্যেও কম ছিল না। প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব, বক্তব্যের তীক্ষ্ণতা, ভাষার চমক সমস্ত কিছুই বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম। তাছাড়া প্রবন্ধগুলির বক্তব্য-বিষয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জনসাধারণের মনে প্রতিবাদের প্রেরণা সৃষ্টিতেও বেদমন্ত্রের মতো কাজ করেছিল। তৎকালীন ভারতবর্ষের পটভূমিতে অবস্থান করে তিনি যেমন কাব্যসাহিত্যে তাঁর অসাধারণ সাহিত্যপ্রতিভার পরিচয় রেখে যেতে পেরেছেন, ঠিক তেমনি প্রবন্ধসাহিত্যের ক্ষেত্রেও নিজস্ব সাহিত্যচিন্তাকে আমাদের কাছে তুলে ধরতে ব্যর্থ হননি। তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা কম হলেও সেগুলি বিষয়বস্তু, বর্ণনা, উপস্থাপন ও স্টাইলের দিক থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে।

সাত.

পরিশেষে বলা যায়, নজরুলের কাব্য-কবিতা বিশ্লেষণ করলে আমরা যে নজরুলকে পাই তা হল – বিদ্রোহী, সমাজসেবী, মানবপ্রেমিক, দেশপ্রেমিক; ঠিক তেমনি তাঁর প্রবন্ধসমূহেও আমরা সেই নজরুলকেই পাই। সাহিত্য, যুদ্ধ-প্রসঙ্গ, রাজনীতি, স্বদেশপ্রেম, মানবতার প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে তাঁর প্রবন্ধে স্থান করে নিয়েছে। মানুষ, সমাজ ও অখণ্ড ভারতবর্ষই ছিল তাঁর স্বপ্ন। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে যে বস্তুনিষ্ঠতা, যুক্তি ও চিন্তার নৈর্ব্যক্তিকতা এবং গভীরতা থাকা প্রয়োজন তা নজরুলের প্রবন্ধসমূহে তেমনভাবে পাওয়া যায় না। তবে তাতে রয়েছে স্বদেশের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা। কয়েকটি প্রবন্ধে তাঁর সাহিত্য সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাও ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধসমূহের বক্তব্যের ওজস্বী আন্তরিকতা, অকৃত্রিম স্বাদেশিকতা আর অপরিসীম মানবতাবোধ প্রাবন্ধিক নজরুলের সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ফেলে এবং তা পাঠকরুচির নৈকট্য ও

দেশপ্রেমিকের হৃদ্‌স্পন্দনের সম্মিলনে এক বিশেষ প্রবণতার পরিচায়ক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে নির্দিষ্ট অবস্থান করতে সক্ষম হয়েছে। নৈরাশ্য ও হতাশায় নিমজ্জিত পরাধীন ভারতবর্ষের পুনর্জাগরণের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর প্রবন্ধসমূহ যে সময়-পরিসর অতিক্রমী কালান্তরের স্মারক হয়ে উঠেছে একথা অবশ্যই স্বীকার্য। তিনি সাহিত্যবিষয়ক মাত্র তিনটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। উক্ত তিনটি প্রবন্ধের জন্যই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের দরবারে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকতেন। উক্ত প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ করে আমরা তাঁর সাহিত্যভাবনার সাথে পরিচিত হতে পেরেছি। তাঁর সাহিত্যভাবনা অন্যান্য সাহিত্যিকদের সাহিত্যভাবনার মতো ততটা তাত্ত্বিক ও গূঢ়ধর্মী নয়। তাঁর সাহিত্যভাবনা তত্ত্বসর্বস্ব না হলেও কিছুটা তত্ত্বলগ্ন একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। তাঁর সাহিত্যধর্মী প্রবন্ধগুলি দুরূহ, কঠিন ও গূঢ় তত্ত্বধর্মী হয়ে ওঠেনি। তাঁর ভাষার লালিত্যে প্রবন্ধগুলি সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। নীরস তত্ত্বের অচলায়তনে আমাদের চিন্তাশক্তি আবদ্ধ না থেকে সহজেই তাঁর সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কে আমরা বোধগম্য হতে পারি। এখানেই যে নজরুলের সাহিত্যচিন্তা মৌলিক, অনন্য ও ব্যতিক্রমী হয়ে উঠতে পেরেছে তা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়।

তথ্যসূত্র:

১. রহমান, মুহম্মদ মতিউর, *গদ্যশিল্পী নজরুল*, নজরুল একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ: ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২, পৃষ্ঠা. ২৪

২. ইসলাম, কাজী নজরুল, ‘বাংলা সাহিত্যে মুসলমান’, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পা.), *নজরুল রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ: জুন ২০১২, পৃষ্ঠা. ৩৮৮

৩. তদেব, পৃষ্ঠা. ৩৯০

৪. তদেব, পৃষ্ঠা. ৩৮৯

৫. ইসলাম, কাজী নজরুল, ‘বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য’, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পা.), *নজরুল রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জন্মশতবর্ষ সংস্করণ: নভেম্বর ২০১২, পৃষ্ঠা. ২৪

৬. তদেব, পৃষ্ঠা. ২৫

৭. ইসলাম, কাজী নজরুল, ‘বড়র পিরীতি বালির বাঁধ’, রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পা.), *নজরুল রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ২৯

৮. মণ্ডল, কমলচন্দ্র, *নজরুল সাহিত্যে সমাজভাবনা*, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: কলকাতা বইমেলা, ২০০৯, পৃষ্ঠা. ৯৭-৯৮

৯. গুপ্ত, সুশীল কুমার, *নজরুল চরিত মানস*, নবযুগ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৬৭, পৃষ্ঠা. ২৭০